অশুভ ‘এক-এগারো’ থেকে সাবধান

আবুল হোসেন খোকন

‘এক-এগারো’ কেন? কেন এই নামে একে পরিচয় বা প্রতিষ্ঠা করানো? হয়তো না বুঝেই, অথবা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত এই শব্দটি অনেকে ব্যবহার করেন, এবং বলেনও। নেতারাও বলেন। মন্ত্রী-এমপিদেরও অনেকে উদ্ধৃতি টানেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ড. ফখরুদ্দিনের সরকারে আসার দিনটি যদি ‘এক-এগারো’ হয়, তাহলে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের সরকারে আসার দিন, বিচারপতি হাবিবুর রহমানের সরকারে আসার দিন, কিংবা বিচারপতি লতিফুরের সরকারে আসার দিনটি সেই তারিখের ওপর প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি পাবে না কেন? কেও কেও হয়তো বলতে পারেন, সাহাবুদ্দিন-হাবিবুর-লতিফুরের সরকারের সঙ্গে ফখরুদ্দিনের সরকারের বড় মাপে তফাৎ ছিল। সাহাবুদ্দিন-হাবিবুর-লতিফুর সরকার ছিল সত্যিকারের তত্ত্ববধায়ক সরকার। তারা ৯০ দিনে জন্য ক্ষমতায় এসে দায়িত্ব পালন করে চলে গেছে। কিন্তু ফখরুদ্দিন সরকার তা করেনি। নামে তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলেও এ সরকার ছিল আসলে সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষীদের ছায়া সরকার। সে কারণেই এ সরকারকে ফখরুদ্দিন সরকার না বলে বলা হয় ফখরুদ্দিন-মঈন উ সরকার। আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মেয়াদ যেখানে ৯০ দিন অর্থাৎ তিন মাস, এবং এই তিনমাসেই নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিতদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে তাদের বিদায় নেবার কথা− সেখানে ফখরুদ্দিন-মঈন সরকার তা না করে তিন মাসের জায়গায় ২ বছর ক্ষমতা আঁকড়ে রেখেছিল, এবং চেয়েছিল আজীবন ক্ষমতায় থাকতে। ফলে এই সরকার মোটেও স্বাভাবিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল না, এবং তাদের উদ্দেশ্যও স্বাভাবিক ছিল না। এ কারণেই তাদের ক্ষমতায় আসার দিনটি ‘এক-এগারো’ হিসেবে চিহ্নিত।
প্রশ্ন হলো ‘এক-এগারো’র সরকার এদিক থেকে অন্যায়, অবৈধ এবং অপরাধমূলক কাজটিই করেছে। তাদের অপরাধ, তারা ক্ষমতা দখল করে রাখার মিশন নিয়ে নেমেছিল এবং ওই সরকারের ছত্রছায়ায় জেনারেল মঈন উ আহমেদ বেশ কিছু অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক দর্শনও উপস্থাপন করে দেশ পরিচালনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই হিসেবে তিনি ‘এক-এগারো’ কে একটি দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি ‘এক-এগারো’ কে একটি দর্শন, এবং এই দর্শনকে একটি মাইলফলক হিসেবে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। অথচ কাজটি ছিল গণতন্ত্রবিরোধী, আইনবিরোধী এবং সংবিধানবিরোধী। তাহলে আজ যারা ‘এক-এগারো’ ‘এক-এগারো’ বলে প্রচার করি, উদাহরণ টানি− তারা কি নিজের অজ্ঞাতেই ফখরুদ্দিন-মঈন উ দের কূ-আদর্শকে সু-আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিতকরণের কাজটি করছি না? কারণ, সহজভাবে ‘এক-এগারো’ স্বীকার করাকে গ্রহণ করাই বলা যায়। যে তথাকথিত এক-এগারোকে আমরা প্রত্যাখ্যান করবো, ঘৃণা করবো− তাকে আমরা আামাদের অজ্ঞাতে উল্টোভাবে প্রকাশ করে কার স্বার্থ রক্ষা করছি? নিশ্চয় গণতন্ত্র, আইন বা সংবিধানের স্বার্থে এটা হতে পারে না। আর এ কারণেই ওই শব্দটি রীতিমতো আপত্তিকর। কারণ ওটা একটা অন্যায়-অবৈধ-অসাংবিধানিক ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। ওটা একটা ঘৃণার প্রতীক। তাই ওই অন্যায়কে প্রতিষ্ঠিতকরণ নয়, বরং একে ময়লা ফেলার পাত্রে ফেলে দেয়াটাই উচিত। তবে প্রাসঙ্গিক কারণে বা উদাহরণ টানতে ওই ঘৃণিত শব্দটির কথা উলেখ করার প্রয়োজন হলেও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে নিশ্চয় শব্দটি তথাকথিত বা কথিত শব্দ হিসেবেই আসতে পারে। কারণ ওটা কোন স্বীকৃত ভাল দর্শন নয় যে একে ইতিহাসের শুভ পাতায় প্রতিষ্ঠিত করবো। অবশ্য এই প্রতিষ্ঠা যে কেও কেও চান না− তা নয়। কারণ এখনও ঘাপটি মেরে থাকা কথিত এক-এগারোর চামচা বা জিয়া-এরশাদের সামরিক শাসনের দোসররা রয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ কূমতলবের স্বার্থে তাদের জন্য এ শব্দটা তো মাইলস্টোন। অতএব,............হইতে সাবধান।
আমরা জানি, বিএনপি-জামায়াত জোট যখন নিজেদের পছন্দসই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বানিয়ে আবারও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্রে ব্যস্থ ছিল, তখনই কথিত এক-এগারোর ঘটনা ঘটে। বেগম খালেদা জিয়ার সাম্প্রতিক ভাষ্য অনুযায়ী, তখনকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিনকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে জেনারেল মঈন উ আহমেদরা ক্ষমতা কব্জা করেন এবং ড. ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে তাদের পছন্দসই নতুন তত্ত্বাবধায় সরকার গঠন করেন। বেগম জিয়ার ভাষ্যমতে, ওই সরকার বিএনপি নিধনে নেমে পড়েছিল। কিন্তু আমরা জানি, লোক দেখানোর জন্য বিএনপির মহাদুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু

হলেও ওই সরকারের আসল টার্গেট ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তিসহ আওয়ামী লীগ। মাইনাস টু ফর্মূলার নামে কার্যত শেখ হাসিনাকে মাইনাস করার মরিয়া চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা এও জানি, এজন্য তাকে হত্যা করারও নানা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু এরকম টার্গেট থেকে পুরো মুক্ত ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া। এমনকি কথিত এক-এগারোর উদ্যোক্তারা অনেকবার খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেনদরবারও করেছিলেন। আমরা আরও জানি, ওই কথিত এক-এগারোর উদ্যোক্তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতি থেকে রাজনীতিকদের নির্মূল করা, রাজনীতিকে নির্মূল করা এবং রাজনীতির জায়গায় ওই উচ্চাভিলাষীদের আমরণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে তারা তাবেদার দল বানানোসহ হেন কাজ নেই যা করেনি। কিন্তু শুধুমাত্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শক্তি এবং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক শক্তির কারণে তারা সফলকাম হতে পারেনি। বরং ওইসব অপতৎপরতা চালাতে গিয়ে পরিস্থিতি এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, তখন আর তাদের জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে বিদায় নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না। সে অনুযায়ী দেশে নির্বাচন হয়েছে এবং মানুষ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোটকে বিজয়ী করে ক্ষমতায় বসিয়েছে। এভাবেই বিদায় বা পতন ঘটেছে উচ্চাভিলাষীদের তথাকথিত এক-এগারো'র।

আগেই উলেখ করা হয়েছে, কথিত এক-এগারো বা ওয়ান-ইলেভেন মোটেও স্বাভাবিক ঘটনা নয়। নয় বলেই সাহাবুদ্দিন, হাবিবুর রহমান বা লতিফুরের সঙ্গে এটি একাকার হতে পারেনি। এটি আলাদা এবং এই আলাদাকে একটি বিশেষ দর্শন হিসেবে দাঁড় করানো বা টিকিয়ে রাখার জন্যই মহলবিশেষ থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে। ষড়যন্ত্র যতক্ষণ থাকবে ততোক্ষণ এ চেষ্টাও থাকবে। চেষ্টা আছে বলেই কথায় কথায় কথিত এক-এগারোকে প্রচার করা হয়। যারা সজ্ঞানে সুস্থ মস্তিষ্কে এটা করছে– তাদের ওপর অন্ধকারের শক্তির আছর আছে, বা তারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ওই অপশক্তিকে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করছে– তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমরা আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ শক্তি সবসময় গণতন্ত্রের পাটফর্ম হিসেবে রাজনীতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। অথবা চেয়েছে রাজনীতিকে কলুষিত করতে। তারা প্রমাণ করতে চেয়েছে রাজনীতিই যতো সংকটের মূল। রাজনীতি থাকলে বাংলাদেশ এগুতে পারবে না। এজন্য রাজনীতিমুক্ত হতে হবে– ইত্যাদি। আমরা এও জানি, এ ধরণের কথা বলে জেনারেল জিয়া বা এরশাদের মতো উচ্চাভিলাষীরা নিজেরাই রাজনৈতিক দল বানিয়েছেন এবং সে রাজনীতিকে রেখেছেন সমর ছাউনিভিত্তিক। আর সে রাজনীতিতে স্থান পেয়েছে দেশপ্রেমিক মানুষের বদলে দেশধ্বংসকারী রাঘববোয়ালরা। তাতে স্থান পেয়েছে সামরিক-বেসামরিক আমলা, যুদ্ধাপরাধী-রাজাকার-আলবদর-জঙ্গি, দুর্নীতিবাজ, লুটপাটকারী, টাউট-বাটপার এবং ধান্ধাবাজ-সুযোগসন্ধানীরা। এদের কবলে পড়ে দেশের বারোটা কীভাবে বেজেছে– তা আমরা জেনারেল জিয়ার পাঁচ বছর, জেনারেল এরশাদের নয় বছর এবং তাদের গড়া রাজনৈতিক দলের এক যুগেরও বেশী সময় ধরে লক্ষ্য করেছি। এই অবস্থায় দেশ এবং দেশের অর্থনীতিরই শুধু বারোটা বাজেনি, ধ্বংস করা হয়েছে তরুণ-যুবকদের নৈতিক চরিত্র। তাদেরকে বানানো হয়েছে সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, টেন্ডারবাজ, কালোটাকার মালিক। বলা যায় এভাবে একটি জাতির মেরুদণ্ডই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমূলে। ফলে আজকের যে বাংলাদেশ, সে বাংলাদেশ বিদ্ধস্থ, ক্ষতবিক্ষত বাংলাদেশ। এখানে কেবল দগদগে ঘা, পুঁজ আর পুঁতিময় ক্ষত।

বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ক্ষত থেকে সহসাই আজ বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। এখান থেকে বেরুতে প্রয়োজন একাত্তরের মতোই আরেকটি যুদ্ধ, প্রয়োজন দেশ গড়ার নতুন আরেকটি লড়াই। কিন্তু তথাকথিত এক-এগারো মোটেও সেটা চায় না। তারা চায় লড়াইয়ের উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিতে, চায় যাত্রাপথকে ভিন্নখাতে ঠেলে দিতে, চায় আমাদের বিজয়ের যুদ্ধটাই বানচাল করে দিতে। সুতরাং সতর্ক থাকার বিষয় এখানেই।

[১০ জানুয়ারি ২০১০ ঢাকা, বাংলাদেশ]

- **আবুল হোসেন খোকন :** সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট।